# মধ্যযুগীয় বাংলা ও অসমীয়া সাহিত্যে
# মৈথিলি ভাষার প্রয়োগ : একটি তুলনামূলক আলোচনা

রিঙ্কা দে, সহকারী অধ্যাপিকা
জাগীরোড মহাবিদ্যালয়

আধুনিক ভারতীয় ভাষা রূপে, মৈথিলি ভাষার উদ্ভব নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে নানান অভিমত আজও প্রচলিত হয়ে আসছে। মৈথিলি ভাষা উদ্ভবের মূল উৎস বলে ধরা হয়েছে মাগধী প্রাকৃত ভাষাকে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা বৈদিক সংস্কৃত ভাষার প্রচলিত কথ্যরূপগুলো মধ্য ভারতীয় আর্যে রূপান্তরিত হয়। যাকে দুই পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছিল পালি ও প্রাকৃত রূপে। যার ব্যাপ্তিকাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ আজ থেকে ৬০০ অবরোধ পর্যন্ত। পালি ভাষা বুদ্ধদেবের নির্দেশে জন্মলাভ করা এক মিশ্র ভাষা। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রাকৃত ভাষা যা বিভিন্ন সংস্কৃত নাটকে 'নিকৃষ্টজনের বা ইতর জনের ভাষা' রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। অঞ্চলভেদে প্রাকৃত ভাষার চারটি স্তর রয়েছে---- শৌরশেনী প্রাকৃত, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত, মাগধী প্রাকৃত, অর্ধ মাগধী বা জৈন মাগধী প্রাকৃত। এছাড়াও পৈশাচী প্রাকৃত বলে আরও একটি ভাষা ছিল কিন্তু এতে কোন সাহিত্য রচিত হয়নি। এর মধ্যে মাগধী প্রাকৃত ছিল সাধারণজনের মুখের ভাষা। সংস্কৃত ভাষার ন্যায় প্রাকৃত ভাষারও ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল কিন্তু ব্যাকরণের বাঁধ প্রাকৃতের ভাঙ্গনকে রোধ করতে পারেনি। তাই পরবর্তী যুগে ভাষার নিয়ম কানুন শিথিল হওয়ার জন্য উচ্চারণ আরো বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়। এই স্তরে এসে অপভ্রংশ জন্ম লাভ করে, এর কাল ব্যাপ্ত ছিল খ্রিস্টীয় ৬০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টীয় ১০০০ অব্দ পর্যন্ত। পূর্বোক্ত চারটি প্রাকৃত ভাষা থেকে তার নাম দিয়ে অপভ্রংশের আবির্ভাব পরিকল্পিত হয়। যেমন---- শৌরশেনী প্রাকৃত থেকে শৌরশেনী অপভ্রংশ, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ, মাগধী প্রাকৃতিক থেকে মাগধী অপভ্রংশ এবং অর্ধমাগধী অপভ্রংশ। এই মাগধী অপভ্রংশ থেকে মৈথিলী, বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, ভোজপুরিয়া ভাষা রূপ লাভ করে। এই প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন---

> “আমাদের বাংলা ভাষা এই মাগধী অপভ্রংশের ; তার আর ক’টি সন্তানের নাম হলো মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরিয়া, অসমীয়া ও ওড়িয়া”।১

বিহারী ভাষাগুচ্ছের মধ্যে একমাত্র মৈথিলিই সাহিত্য আকাডেমী স্বীকৃতি প্রাপ্ত ভাষা। বিহারের দাঁড়ভাঙ্গা, মজাফফরপুর, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, উ: সাঁওতাল পরগনা এবং পূর্ব চম্পারন অঞ্চলে প্রচলিত ভাষা মৈথিলি। ‘মৈথিলী গ্রামার’গ্রন্থে জর্জ গ্রীয়ারসন বলেছেন ----

"মৈথিলী একটি স্বতন্ত্র ভাষা, উপভাষা নয়। এটি এমন লক্ষলোকের কষ্ট করে না করে হিন্দি বা উর্দুভাষা বলতে বা বুঝতে পারে না"।২

প্রাচীনকাল থেকে সাহিত্য সম্পদে মৈথিলি অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ভাষা। চতুর্দশ শতকে জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর 'বর্ণ রত্নাকর' বা 'বর্ণন রত্নাকর' নামক প্রথম গদ্য গ্রন্থ মৈথিলি ভাষায় রচনা করেছিলেন। এই শতাব্দীর প্রথম পাদে উমাপতি ওঝার রচিত পারিজাত হরণ নাটকের পদাবলী ও বর্ণানরত্নাকর গ্রন্থদয় মৈথিলী ভাষা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এই ভাষা লিপি নিয়ে ও নানা মনির নানা মত প্রচলিত আছে। জয়কান্ত মিশ্র তাঁর গ্রন্থে বলেছেন ----

" মৈথিলি ভাষার লিপি যাকে 'মৈথিলী লিপি' 'মিথিলাক্ষর' বা 'মৈথিলাক্ষর' প্রভৃতি নামে ডাকা হয় এবং যার সঠিক নাম হল তীরহুতা"।৩

মৈথিলি ভাষায় একসময় তীরহুতা/ তীরহুতি লিপি ব্যবহৃত হতো কিন্তু পরবর্তীকালে দেবনাগরী লিপি ব্যবহার হওয়ার ফলে অনেকের ধারণা জন্মায় যে মৈথলি ভাষা তথা ভাষা গোষ্ঠী হিন্দি ভাষার সঙ্গে যুক্ত। আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দে মৈথিলি মাগধী প্রাকৃত থেকে পৃথক হয়ে একটি স্বতন্ত্র ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করে। মিথিলায় কর্নার রাজাদের রাজত্বকালে নান্যদেব(১০৯৭) থেকে হরিসিংহদেবের (১৩২৪) শাসনকালে মধ্যে সমস্ত রাজ্য জুড়ে সংগীতচর্চার ঢেউ উঠেছিল। অনুমান করা হয়েছে এই সময়কালের মধ্যে মৈথালী ভাষা সংগীতের সহচরী হিসেবে স্থান করে নিয়েছিল। কারণ মৈথিলি সাহিত্যের প্রকাশ ঘটে পূর্ণাঙ্গ রূপে ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

এক সময় উত্তর-পূর্ব ভারতের সাহিত্য সংস্কৃতির প্রানকেন্দ্র ছিল মিথিলা রাজ্য। মিথিলার প্রতিবেশী রাজ্য বঙ্গদেশ, অসম, উড়িষ্যা থেকে বিভিন্ন পন্ডিতেরা সেখানে যেতেন বিদ্যা চর্চা লাভের জন্য। মধ্যযুগীয় মিথিলার জনপ্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতি যাঁকে 'মৈথিল কবি' আখ্যা প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যাপতির প্রভাব মিথিলার কবিদের মধ্যে এত বেশি ছিল যে কবিরা তার নামের সঙ্গে প্রতিযোগ করে তার সমতুল্য হওয়ার চেষ্টায় করেছিলেন, উমাপতি, নন্দবতী, রমাপতি, কৃষ্ণপতি,শ্রীপতি, হরপতি, মহিপতি,লক্ষীপতি ইত্যাদি। তাঁর পদের মাধুর্য শুধু মিথিলাতেই নয়, মিথিলার প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে প্রভাব বিস্তার করে। বিদ্যাপতির খ্যাতি মূলত ছিল তাঁর বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের জন্য। মিথিলা-তিরহুতে বিদ্যাশিক্ষা লাভের জন্য বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাওয়া প্রত্যাগত বিদ্যার্থীদেরা বিদ্যাপতির পদ অনুসরণ করে নিজ নিজ ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন। বঙ্গদেশে আনুমানিক পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর অনেক আগ থেকেই বিদ্যাপতির পদাবলীর যে প্রচলন আরম্ভ হয় তা আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির পদাবলীর গভীর প্রভাব পড়ার অন্যতম

কারণ হচ্ছে স্বয়ং মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সেই মধুময় পদ আস্বাদন করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে বলেছেন----

"চন্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি

কর্নামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।

স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিনে

গায়ে শুনে পরম আনন্দ"।।৪

মধ্যযুগীয় বাংলা ও অসমীয়া সাহিত্যে বা মিথিলার প্রতিবেশী সাহিত্যে মৈথিলি ভাষার প্রয়োগ হুবহু পাওয়া না গেলেও কিছু রূপতাত্বিক ব্যবহার প্রচলিত। বিদ্যাপতির দ্বারা নতুন সৃষ্ট ভাষা অর্থাৎ ব্রজবুলিতে মৈথিলি ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ব্রজবুলি একটি কৃত্রিম ভাষা যে ভাষায় লোকে কথা বলে না। এই ভাষার উৎপত্তি নিয়েও পন্ডিতের মধ্যে অনেক মতানৈকের সৃষ্টি হয়েছে। মৈথিলি ভাষার বৈশিষ্ট্য যা বাংলা ও অসমীয়া মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বর্তমান---

ক) মৈথিলি ভাষাযর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অতীতকালে '-ল' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন- ভৈল=হইল।

খ) যৌগিক কাল বোঝাতে 'আছ' এবং 'রহ' ধাতুর প্রয়োগ মধ্যযুগীয় বাংলা ও অসমীয়া সাহিত্যে বর্তমান। যেমন বাংলায় 'থাক' ব্যবহৃত হয়। আবার দেখইতছহ অবইত থেকে 'রহব' -এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

গ) বহুবচন পদ গঠনে '' এবং 'লোকানি' প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দের যোগে বাক্য গঠিত হয়েছে মধ্যযুগের সাহিত্য।

সহায়ক গ্রন্থ:

ক) ব্রজবুলি সাহিত্য মুকুৰ : ড° ভূপেন্দ্র ৰায়চৌধুৰী

খ) মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাস : জয়কান্ত মিশ্র

গ) বৈষ্ণব পদাবলী : ডঃ সনাতন গোস্বামী (সম্পাদিত)

ঘ) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঙ) ভাষাবিদ্যা পরিচয় : পরেশচন্দ্র মজুমদার

চ) কালিয়া দমন নাট : ড° বসন্ত কুমাৰ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত)